ভারতীয় বস্তুবাদের উত্তরাধিকার

বিরঞ্জন রায়

'ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ' শিরোনামে ভারতীয় দর্শন নিয়ে এই লেখকের তিন কিস্তি আলোচনা প্রকাশিত হবার পর ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান বিষয়ে এই লেখার প্রথম পর্ব ছাপা হয়েছে গত সংখ্যায়। এই অনুসন্ধানে এই অঞ্চলের চৈতন্যে মুসলিম আগমন, ঔপনিবেশিক শাসনের বিবিধ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে লেখক লোকায়ত দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে বস্তুবাদী ধারার চিহ্ন শনাক্ত করেছেন। এবারে প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব। আমরা এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিতভাবে আরো লেখা/মতামত/বিতর্ক প্রকাশে আগ্রহী।

৩.৩.২। তন্ত্রের রূপান্তর

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনার লক্ষ্য হলো পরম ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন। এই মিলন বিরাট এক আত্মার সাথে তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পুনঃসংযোগ, আর তা এক অতীন্দ্রিয় জগতেই সম্ভব। এখানে সবই পরমার্থ, তাই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনা মুখ্যত এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকায়নি; তাকিয়েছে এর বাইরে কোনো এক অলৌকিক জগতের প্রতি। বিপরীতে তন্ত্র প্রত্যক্ষ, বাস্তব কোনো সত্যকে অবলম্বন করতে চেয়েছে; তাই এর দৃষ্টি প্রধানত এই পৃথিবীর ওপর, দেহের ওপর নিবদ্ধ। যদিও তান্ত্রিকদের দেহ-সাধনা নিম্নতম সোপান থেকে ঊর্ধ্বপথে যেতে যেতে অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তথাপি তা কখনো দেহাতীত নয়। দেহই সমস্ত সাধনার একমাত্র উপলব্ধিক্ষেত্র, একমাত্র প্রসারভূমি। এদিক থেকে তাদের আদর্শ ও সাধনা বাস্তবকে কেন্দ্র করেই গঠিত। তাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজিয়াদের ভাবাকাশ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সাধনার ভাবাকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; যাগ-যজ্ঞ-হোমাগ্নি ও মন্ত্র গুঞ্জরণের বিরুদ্ধে তাঁদের সাধনা মূর্ত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ স্বরূপ। এই সব একান্ত বাহ্য অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের প্রয়োজন তাঁদের নেই; কেননা তাঁরা দেহের মতো বাস্তব ও সত্য বস্তুকে আশ্রয় করেছেন। তাঁদের আশ্রয়কে সত্য করে তোলার জন্য কোনো বাহ্য আয়োজনের প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনকালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বজ্রযান কালচক্রযান সহজযান প্রভৃতি সাধন প্রণালির রূপ নিয়েছিল। নিম্নবর্গের উদ্ভাবিত সহজযান উচ্চবর্গের মানুষের ভাবাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। পরবর্তীতে সেই নিম্নবর্গই নাথপন্থা, অবধূতবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে তাদের দর্শনের বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটায়। এ সবই ছিল কর্তৃত্বশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাকৃতজনের দার্শনিক হাতিয়ার। শাসক শ্রেণি প্রচারিত 'অফিসিয়াল' বৌদ্ধ মতবাদ তাদের হাতে 'লৌকিক বৌদ্ধমতে' রূপান্তরিত হয়। কৌম ঐতিহ্যের সাম্যচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে তারা 'হিন্দু' মতবাদেরও লৌকিক সংস্করণ তৈরি করে নেয় এবং সে ক্ষেত্রে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সাম্যচেতনাসম্পন্ন ইসলাম ধর্মকেও এর রক্ষণশীল ব্যাখ্যাদাতাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তারা, দেশীয় লৌকিক ধারার সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করে 'লৌকিক ইসলাম'। লৌকিক বৌদ্ধ, লৌকিক হিন্দু, লৌকিক ইসলাম–এই সবই প্রাকৃতজনের দর্শনচিন্তাকে নানাভাবে পুষ্ট করে, কৌম ঐতিহ্যসম্পন্ন বাঙালির লোকচেতনায় বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সংযোজন ঘটায়।

তৎকালীন সামন্ত সমাজের নানা স্তরবিন্যস্ত ভেদবৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য 'আধ্যাত্মিক সাম্য ও মরমিয়া প্রেমভক্তিবাদ'-এর পতাকা উড়িয়ে দেন, আর সেই পতাকার তলে নির্যাতিত প্রাকৃতজন দলে দলে সমবেত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্র ও দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেও শ্রীচৈতন্য সেই অভিজাত জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করেছিলেন, অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন 'জীবননির্ভর মানবতাবাদী আদিম-লৌকিক ধর্ম সংস্কারের বিবর্তিত ধারাবাহিকতা'র উত্তরাধিকারকে। অর্থাৎ চৈতন্য মতবাদেরও অঙ্গীভূত ছিল প্রাকৃত বাঙালির দর্শনের উপাদান। এ কারণেই লোকসাধারণের ব্যাপক অংশ চৈতন্য ভাবধারাজাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের হাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অভিজাত চরিত্র লাভ করে বসে। তখন, তারই বিপরীতে, চৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের নেতৃত্বে প্রাকৃতজনের এষণাকে অবলম্বন করে একটি লৌকিক বৈষ্ণববাদ গড়ে ওঠে। বৈষ্ণব সহজিয়া মত এই লৌকিক বৈষ্ণববাদের আশ্রয়ে সৃষ্ট প্রাকৃতজনের দর্শনেরই আরেক রূপ।

লালন শাহ দরবেশি-ফকিরি সাধনাকে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার সঙ্গে সমীকৃত করে এক নতুন সাধন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই সাধনার গোপন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে দরবেশি আচারের সঙ্গে বৈষ্ণব তান্ত্রিক সহজিয়া যোগাচারের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। লালন শাহর সাধন-প্রক্রিয়ায় 'কলেমা'র সঙ্গে 'মন্ত্র', 'বীজমন্ত্রে'র সঙ্গে 'ইসমে আজম', পরিচ্ছদে 'ডোর-কৌপীন'-এর সঙ্গে 'খিলফা-ঝোলা-আশা' প্রভৃতি স্থান লাভ করেছে। দুদ্দু শাহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সাধনার এই ধারা হলো 'দরবেশি বাউলে'র ধারা। এর উদ্‌গাতা লালন নন, উদ্‌গাতা সপ্তদশ শতকের নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র।

৩.৪। কিছু নজির

'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তিতে তিষ্টতি কলেবরে' অর্থাৎ 'যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' এটাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। সহজিয়া বৌদ্ধ, সহজিয়া বৈষ্ণব এবং বাউল–সব ধারার পেছনে রয়েছে তন্ত্রের প্রভাব। প্রকৃতিসংগত সহজ জীবনাচরণই বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউলদের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ সহজ সাধকরা শূন্যবাদ-বিজ্ঞানবাদ সমস্ত বর্জন করে ধরে রাখেন একমাত্র দেহবাদ বা কায়াসাধন। তাঁরা এককথায় বলে দিয়েছেন, 'দেহহি বৌদ্ধ বসন্ত ন জানই'–মূর্খ, তুমি জানো না দেহের মধ্যেই বুদ্ধ বা পরমজ্ঞান। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'শূন্যতা' হলো 'প্রকৃতি' আর 'করুণা' হলো 'পুরুষ'। এই শূন্যতা ও করুণা বা নারী-নরের মিলনে যে মহাসুখ, সেটাই ধ্রুব সত্য। তাঁরা মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারেননি; বলেছেন, 'কী হবে মন্ত্রে, কী হবে তন্ত্রে, কী হবে ধ্যান ব্যাখ্যানে? মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত না হলে পরম নির্বাণ লাভ হয় না। সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করে ইন্দ্রিয়াদি ভোগ করো।' (দারিকপাদ)

তাঁরা শুধু যে মন্ত্রতন্ত্রকে অর্থহীন বলেছেন তা-ই নয়, তাঁরা সরাসরি শাস্ত্রকে চ্যালেঞ্জও করেছেন। সরহপাদের উক্তিতে, "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল, যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন তো অন্যে যে রূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেই রূপেই হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব

রহিল কী করিয়া? যদি বলো, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হউক; যদি বলো বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যে তো বেদের শব্দ আছে। আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোক দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এইমাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথমত তাহাদের অথর্ববেদের সত্তাই নাই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ তো আর পরমার্থ নয়, বেদ তো আর শূন্য শিক্ষা দেয় না; বেদ কেবল
বাজে কথা বলে।"

এবার সহজিয়া বৈষ্ণবদের কথা শুনুন। 'অমৃত রত্নাবলী' পুঁথিতে রয়েছে :
"প্রথম সাধন রতি সম্ভোগ শৃঙ্গার।
সাধিবে সম্ভোগ রতি পালাবে বিকার ॥
জীব রতি পূরে যাবে করিলে সাধন।
তারপর প্রেম রতি করি নিবেদন ॥"

সমাজের উচ্চকোটিতে একদিকে আছে চরম ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয় লালসা স্রোত, অন্যদিকে সে স্তরেই একদল দার্শনিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিরোধী কৃচ্ছ্র ও ত্যাগের কথা প্রচার করেন। এই চরম ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয় নিরোধবাদ–উভয়ই স্বভাববিরোধী। সে তুলনায় নিম্নকোটি জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত সহজিয়া দর্শন কত সহজেই না এ দুই চরমের অস্বীকার করে সহজ স্বাভাবিক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন গ্রহণ করেছে।

সাম্যচেতনাসম্পন্ন ইসলাম ধর্মকেও এর রক্ষণশীল ব্যাখ্যাদাতাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তারা, দেশীয় লৌকিক ধারার সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করে 'লৌকিক ইসলাম'। লৌকিক বৌদ্ধ, লৌকিক হিন্দু, লৌকিক ইসলাম–এই সবই প্রাকৃতজনের দর্শনচিন্তাকে নানাভাবে পুষ্ট করে, কৌম ঐতিহ্যসম্পন্ন বাঙালির লোকচেতনায় বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সংযোজন ঘটায়।

সহজিয়া বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে আত্মপরভেদরহিত ও মানুষের প্রতি বিদ্বেষরহিত মানুষের অবস্থান ঈশ্বরেরও ওপরে। তাদের 'রত্নসার' পুঁথিতে লেখা রয়েছে, "ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।"

এ ধারারই উত্তরসূরি বাউল লালনশিষ্য কুষ্টিয়ার দুদ্দু শাহর (১৮৪১-১৯১১ খ্রি.) ঘোষণা:
"বস্তুকেই আত্মা বলা যায়, আত্মা কোনো অলৌকিক কিছু নয়।"

কিংবা
"বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত দেখো সবে নর-বস্তু ধরি ॥
রজঃ বীর্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাঁইজিকে সেই জন চিনে ॥'

অর্থাৎ নারীর রজঃ ও পুরুষের বীর্য–এ দুই বস্তু থেকেই যেহেতু নর বা মানুষরূপ বস্তুর উদ্ভব, সেহেতু বস্তুর বাইরে কোনো কিছুকে স্বীকার করা বাউলদের মতে অর্থহীন।

কুষ্টিয়ার লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রি.) দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন :
"আল্লা হরি ভজন পূজন
সকলি মানুষের সৃজন,
অনামক অচিনায় কখন
বাগিন্দ্রিয় না সম্ভবে।"

কিংবা যে স্বর্গ ও বেহেশতের লোভে হিন্দু-মুসলমানে মানুষের ভাগ, সেই স্বর্গ বা বেহেশতকে ফাটক বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি:
"ফকিরী করবি ক্ষ্যাপা
কোন রাগে।
হিন্দু-মুসলমান দুইজন আছে
দুই ভাগে ॥
বেহেশতের আশায় মোমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন
টল কি অটল মোকাম সেহি
লেহাজ করে জান আগে।
ফকিরী সাধন করে
খোলাসা রয় হুজুরে
ভেস্তের সুখ ফাটক সমান
কার বা তাই ভাল লাগে ॥"

ধনবৈষম্য তথা শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ :
"কেমন ন্যায় বিচারক খোদা বল গো আমায়।
তাহলে ধনী-গরিব কেন এ ভুবনে রয়।
ভাল-মন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালানকোঠার কোলে
শুয়ে নিদ্রা যায় ॥
সেই আমরা মরণের পরে
যাব নাকি স্বর্গপুরে
কে মানিবে এসব হেরে
এই দুনিয়ায়?"

কেবল অভিযোগ নয়, বাউল সাধক ভবিষ্যতের এক শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজের কল্পনা করেছেন। সে সমাজের আর্তি ফুটিয়ে তুলে লালন ফকির বলেন :
"এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু-মুসলমান
বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লাভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে।
আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।"

লালনেরই সমসাময়িক বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের নেতা বলরাম হাড়ির (১৭৮৫-১৮৫০ খ্রি.) পরলোকবিরোধী যুক্তি চার্বাকদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। (বৃষ্টিভেজা এ সন্ধ্যাবেলা/কোন বলরামের আমি চেলা–এ চরণটিতে বলাহাড়িদের কথাই বলা হয়েছে)। বলরাম ছিলেন মেহেরপুর অঞ্চলের জমিদারবাড়ির চৌকিদার। জমিদারের মন্দিরের বিগ্রহের স্বর্ণালংকার চুরি গেলে কর্তারা চোর সন্দেহে বলরামকে প্রচণ্ড মারধর করেন। বলরাম রাগে-দুঃখে বাড়ি থেকে চলে যান। অনেক দিন পর ফিরে এসে নিজ নামে একটি ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। তাঁর মতো সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরাই ছিল সে সম্প্রদায়ের সদস্য।

"একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করিয়া নদীকূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই তুই ও কি

করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর করিল, আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছিলেন তাঁহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীকূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেত জল পাইবে না কেন?"

বাউলের মতোই আরেকটি লৌকিক ধর্ম 'কর্তাভজা'র মতে:
"বর্তমান সত্যজ্ঞান যথাসম্ভবে
অনুমান অনর্থক বৃথা এ ভবে।"

তাই–
"যত তন্ত্রমন্ত্র ধ্যানজ্ঞান
সাধন মতে অনুমান
বর্তমান বিনা ত্রাণ
নাহিক সন্ধান।"

এ জন্য তাদের সিদ্ধান্ত–
"ধর ধর মানুষ ভগবান
মানুষ ভজনে পাবি নন্দের নন্দন
সে যে সদা বর্তমান।"

এরই ধারাবাহিকতা দেখুন বিশ শতকের লোককবি নেত্রকোনার জালাল উদ্দিন খাঁয় (১৮৯৪-১৯৭২ খ্রি.):
"মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে?
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।"

তাঁর কাছে শাস্ত্রীয় ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নয়; মানবতা ও বিশ্বজনীন নীতিবোধই ধর্ম:
"ন্যায়ে থাক সত্য রাখ, ধর্মরক্ষা তারেই কয়
বিশ্ববোধের ধর্মে দেওয়া মানবত্বের পরিচয়।
মিথ্যাটাকে দেও বিসর্জন সত্য সেবায় রাখ জীবন
হিংসা হতে আপনি আপন থাকবে সরে সব সময়।
কুচিন্তা না আসলে মনে পাপ হবে তার কী কারণে
যেতে হয় না জঙ্গল বনে আপন ভাবে যদি রয়।
দেখছি সব খোঁজ করিয়া আসল ধর্মে বিদায় দিয়া
গেছে মানুষ দল পাকাইয়া দিল হিংসার পরিচয়।
গাছের আগায় জল যে ঢালে গোড়া কাটার থাকেই তালে
বুদ্ধিহারা হলেম হারে ছাড়ল জালাল পাছের ভয়।"

ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী উনিশ শতকের আরেক লোককবি নরসিংদীর দ্বিজদাস গেয়েছেন:
"পাগল দ্বিজদাসের গান।
কেহ শুন বা না শুন, মান বা না মান,
তাতে আমার নাই কোন লাভ লোকসান।
কেহ বলে আছ তুমি, কেহ বলে নাই।
আমি বলি থাকলে থাক, না থাকিলে নাই।
নয়নে দেখি না, শ্রবণে শুনি না,
পরশনে পাই না, মিলে না প্রমাণ॥
মীমাংসা হ'ল না সৃষ্টি হ'তে এ যাবৎ,
অদ্বৈত আর দ্বৈতবাদীর ভিন্ন ভিন্ন মত।
কেহ বলেছে সাকার, কেহ কয় নিরাকার,
আসলে কি প্রকার, কে জানে সন্ধান॥
কাঁদিয়া ডাকিলে পরে উত্তর না পাই,
হাজার ভাল মন্দ বলি, বেজার খুশি নাই।
দিয়ে এমন বোকা, কার কি আছে ঠেকা,
থাকা আর না থাকা, ফলে এক সমান॥
ভক্ত মুসলমানে পড়ে পাঁচ ওক্ত নমাজ,
ত্রিসন্ধ্যা নিয়ম-বাঁধা হিন্দুগণের কাজ।
যারা যায় গির্জাতে, সপ্তাহ পরেতে
তারাই জগতে মানুষ প্রধান।
বাইবেল কোরান বেদপুরাণ, যত সব পুঁথি,
মানি ব'লে মনে বলে এই দুর্গতি।
মানতে মানতে শাস্ত্র, পাই না অন্নবস্ত্র,
লাঠি বঠি অস্ত্র ক্রমে তিরোধান॥"

এখানে শুধু ইহজাগতিকতা নয়, সামাজিক বিদ্রোহের ইঙ্গিতটিও স্পষ্ট।

পাপ-পুণ্যের মতো স্বর্গ-নরক নিয়ে রচিত গানে প্রচলিত বিশ্বাস এবং এর ভেতরের মানসিকতাটির প্রতি দ্বিজদাসের শ্লেষটি দেখুন :
"স্বর্গ কি নরক, করি নাই পরখ,
আছে ব'লে মাত্র শুনেছি।
বলুক যে যা বলে, বিচার করতে গেলে,
নরক ভাল ব'লে বুঝেছি।
ধর্ম বলে, কর্মফলে স্বর্গে ঠাঁই,
পাপী তাপীর পক্ষে দয়াধর্ম নাই,
দয়া নাই যেখানে কে বা যায় সেখানে,
বুদ্ধিমানে বলে ছি ছি ছি।
স্বর্গের মহিমা শাস্ত্রে শুনতে পাই,
সেখানেও আছে খেমটাওয়ালী বাই,
বেশির মধ্যে কেবল চক্ষুলজ্জা নাই,
সম্পর্কেও নাই বাছাবাছি
সুরলোকে সুখে করে সুরাপান
হয় সস্তা, নয় বিনামূল্যে পান,
আমরা খেলে পরে, দোষে (= দোষ দেয়) কেন পরে,
তাতেই ফাঁপরে পড়েছি।"

স্বর্গে ইচ্ছামতো নারীসম্ভোগ ও অপরিমেয় মদ্যপানের সুযোগ বিদ্যমান। নরকে এসবের কিছুই নেই। তাই নরকে কেউ যেতে চায় না। অন্যদিকে ব্যভিচারের আকর্ষণেই মানুষ স্বর্গপ্রাপ্তির লোভে যাগ-যজ্ঞের মতো নানা ধর্মানুষ্ঠান বা তীর্থব্রতাদি করে থাকে। স্মিত হাস্যরসের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিজদাস স্বর্গলোভাতুর তথাকথিত ধার্মিক ও পুণ্যবানদের মুখোশ খুলে ফেলেছেন।

"এ সকল সুখ নরকেতে পায় না,
কাজেই সেখানে কেউ যেতে চায় না,
অসুবিধা বাধা আর কিছু দেখি না,
নরকেই বরং সুরুচি।
মদের কীর্তি বেশ্যাবৃত্তি তথা নাই,
সকলেই যেন সন্ন্যাসী গোঁসাই,
শান্তি তথা বড়, কিসে বলতে পার,
কে বা কবে গিয়ে দেখেছি।
মনে মনে সবে স্বর্গে যেতে চায়,
শতে একজনের ভাগ্যে না কুলায়,
যাগযজ্ঞে শুধু টাকা-পয়সা যায়
জেনেছি জেনেছি জেনেছি।"

লালন শাহ দরবেশি-ফকিরি সাধনাকে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার সঙ্গে সমীকৃত করে এক নতুন সাধন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই সাধনার গোপন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে দরবেশি আচারের সঙ্গে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক-সহজিয়া যোগাচারের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। লালন শাহর সাধন-প্রক্রিয়ায় 'কলেমা'র সঙ্গে 'মন্ত্র', 'বীজমন্ত্রে'র সঙ্গে 'ইসমে আজম', পরিচ্ছদে 'ডোর-কৌপীন'-এর সঙ্গে 'খিলফা-ঝোলা-আশা' প্রভৃতি স্থান লাভ করেছে।

আগে যেভাবে 'বারমাসী' গান গাওয়া হতো, এখন আর সেভাবে চলে না। তাই দ্বিজদাস লেখেন নতুন বারমাসী।

"দুঃখীর দুঃখের কথা ব'লে জানাব কোথা
অরণ্যে রোদন বৃথা জানি।
আছি আছি নাই নাই, ক্ষতিবৃদ্ধি কারো নাই,
যার কাছে যাই হই অপমানী।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস, কত কষ্টে করি চাষ,
রোদের চোটে ফেটে যায় মেদিনী,
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, এ ব্যথা কি বোঝে পরে,
তার উপরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।
আষাঢ় মাসে সুসার নাই, খাজনার কিস্তি পড়ে ভাই,
তাতে আবার খাবার টানাটানি,
সাবেক বাকী সালিয়ানা, বলে না আর শালা বিনা
দেশের মধ্যে নায়েব বাবু যিনি।
তারপর শ্রাবণ ভাদ্র, কখন বৃষ্টি কখন রৌদ্র,
ভিজেপুড়ে হ'ল স্বাস্থ্যহানি,
তাতে নাস্তি ঔষধপত্র পথ্য মোটা অন্ন মাত্র,
মরণ নাই, তাই দেহে র'ল প্রাণী।
আশ্বিন মাসে ধান পাট, বেচে ক'দিন চলে হাট,
এ সময়ে যৎকিঞ্চিৎ আমদানী,
সব ফুরা'ল কাপড় কিনতে, ফাঁফড় হলেম
ভেবেচিন্তে,
দুর্গাপূজায় দুর্গতি এমনি।
আসিল কার্তিক অঘ্রান, পৌষও নহে ব্যবধান,
পাকল ধান আর কি দুঃখ গনি;
মনের আশা মনে র'ল মহাজন ক্রোক করিল,
ক্ষেতে বসল প্যাদা মোতয়নী।
কিছু নিল জমিদার, বাকি মহাজন আর,
আমার রইল জ্বালানি পোড়ানি;
মাঘী মাস-কালাই যা ছিল, বিচন কিনতে
নিছন গেল,
ফাল্গুনের শেষ ভরসা মাগনী।
চৈত্র মাসে কিছু নাই, কর্জ ক'রে ভাত খাই,
ফি টাকাতে মাসে সুদ দু'আনী।
কেঁদে বলে দ্বিজদাস, এই সুখে যায় বার মাস
কে শুনিবে গরিবের কাহিনী।"

নিজে কৃষক না হয়েও কৃষকের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করেই সেই দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বিবেচনা করতে পারতেন। তাই এমন দুঃখের গান তাঁর কলমে রূপ পায় ও উচ্চারিত হয়। এ রকম নিম্নে নেমে এসেই ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনাথ (দ্বিজদাস) ব্রাহ্মণ্য উচ্চম্মন্যতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করে সকল মানুষের জন্য অভিন্ন ধর্মের সন্ধান করেন। ধর্মের নামে নানা ভণ্ডামি দেখে যদিও প্রায়ই তিনি ধর্ম ও ধর্মধ্বজীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে তোলেন, তবু সকল সম্প্রদায়ের ধর্মকে অসাম্প্রদায়িক সত্যের মোহনায় মিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহেই তিনি গেয়ে ওঠেন :

"হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, আদি আর,
ধর্ম নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে অনিবার।
হ'লে হিংসা-দ্বেষ-ছেদ, কিছু হয় না ভেদাভেদ,
তখন তুল্য, বাইবেল, কোরান, বেদ, যেই হিন্দু, সেই মুসলমান।
অহিংসা পরম ধর্ম, জানে মর্ম ভাগ্যবান।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু সব শাস্ত্রের বিধান।
গৌর উপেক্ষিতে জাত, খেলেন যার তার ভাত,
পাগল দ্বিজদাসের মন্দ বরাত, দূর হ'ল না অভিমান।"

সহজিয়া বৌদ্ধ, সহজিয়া বৈষ্ণব, লৌকিক ইসলাম কিংবা বাউল–এ সকলই উচ্চবর্গের স্বার্থরক্ষক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিপরীতে নিম্নবর্গের স্বার্থরক্ষক লৌকিক ধর্ম। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকই হোক কিংবা লৌকিকই হোক, ধর্ম ধর্মই। অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবেচনায় উভয়ই বাস্তবতার উৎকাল্পনিক প্রতিফলন (fantastic reflection of reality)। লোককবিদের কেউ কেউ এ উৎকল্পনামুক্ত হয়ে দুনিয়াকে দেখার, বোঝার এবং মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজদাস এঁদেরই একজন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯ খ্রি.)। তিনি কৌশলে উৎকাল্পনিক তত্ত্বকথা এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠেই শুনুন:

"তত্ত্বগান গেয়ে গেলেন যারা মরমি কবি
আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ দুর্দশার ছবি।
বিপন্ন মানুষের দাবি করিম চায় শান্তিবিধান
মন মজালে ওরে বাউলা গান।"

করিম সোজাসুজি জানিয়ে দেন, তিনি 'কখনোই আসমানি খোদাকে মান্য করেন না', 'মন্ত্রপড়া'কে তিনি 'ধর্ম' বলেন না, 'লাখ লাখ টাকা খরচ করে হজ পালনকে'ও তিনি ধর্ম বলে মানেন না। 'সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ তৈরি করে দিয়েছে' যে ধর্ম, 'কতিপয় হীন মোল্লাপুরুতের' শয়তানিতে 'ভাইয়ে ভাইয়ে বিভাজন নিয়ে এসেছে যে ধর্ম', সেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অতি কঠোর ও দুঃসাহসী মন্তব্য :

"এই বিভাজন যদি ধর্ম হয়, সেই ধর্মের কপালে আমি লাথি মারি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'–এই হলো আমার ধর্ম। নামাজ রোজার মতো লোক দেখানো কর্মে আমার আস্থা নেই। কতিপয় কাঠমোল্লা ধর্মকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।"

"ঈশ্বরকে আমি মনে করি একটা পেঁয়াজ,
খোসা ছিলতে গেলে সব সময় তা ছিলা যায়
এবং হঠাৎ এক সময় দেখা যায় যে তা শূন্য
হয়ে গেছে।"

> এই চরম ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয় নিরোধবাদ–উভয়ই স্বভাববিরোধী। সে তুলনায় নিম্নকোটি জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত সহজিয়া দর্শন কত সহজেই না এ দুই চরমের অস্বীকার করে সহজ স্বাভাবিক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন গ্রহণ করেছে।

ধর্মের উৎকল্পনামুক্ত করিম শুধুমাত্র 'দেশের দুঃখ দুর্দশার ছবি'ই আঁকেন না, এ থেকে উত্তরণের উপায়ও বাতলান। এ সমাধান লৌকিক, ইহজাগতিক।

"আমরা মজুর-চাষি
দেশকে যদি ভালবাসি
সবার মুখে ফুটবে হাসি
দুঃখ যাবে দূরে।
শোষণ-নির্যাতন শুধু
শোষকদলে করে
কৃষক-মজুর এক হয়ে যাও
রবে না আর অন্ধকারে।"

শ্রেণিসচেতন এই কবি বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধেও সচেতন। গরিবের দুঃখের কারণ তিনি ভাগ্য, কর্মফল, কপালের লিখন, ইহজীবনের পাপ কিংবা ঈশ্বরের পরীক্ষার মধ্যে খোঁজেন না; এর কারণ খোঁজেন তিনি সমাজ ব্যবস্থায়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে।

"বড় শয়তান সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন ফন্দি আঁটে
মধ্যম শয়তান পুঁজিবাদ বসে বসে মজা লোটে
সামন্তবাদ জালিম বটে দয়া নাই তাহার মনে।
তিন শয়তানের লীলাভূমি শ্যামল মাটি সোনার বাংলার
গরিবের বুকের রক্তে রঙিন হলো বারে বার
সোনার বাংলা করলো ছারখার সাম্রাজ্যবাদ শয়তানে।
স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মজা মারল শোষকে

এখন সবাই বুঝতে পারে চাবি ঘুরছে কোন পাকে
মধু হয় না বল্লার চাকে বাউল আবদুল করিম জানে।

ধর্মীয় উৎকল্পনামুক্ত, ইহজাগতিক, শ্রেণি ও রাজনীতি সচেতন লোককবিদের মধ্যে আবদুল করিম একটি উজ্জ্বল নাম। তবে এই সংগ্রামে তিনি নিঃসঙ্গ নন। চট্টগ্রামের রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭ খ্রি.), কিশোরগঞ্জের নিবারণ পণ্ডিত (১৯১৫-১৯৮৪ খ্রি.) প্রমুখ একসারি লোককবির তিনি সহযোদ্ধা।

ওপরের নজিরগুলোতে আমরা যে ভাবধারার পরিচয় পেলাম তার লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেহকেন্দ্রিকতা, মানবকেন্দ্রিকতা, ইহজাগতিকতা, প্রত্যক্ষপ্রাধান্যতা। এই ভাবধারা দুঃখবাদবিরোধী, প্রচলিত শাস্ত্রবিরোধী এবং সামাজিক বৈষম্য বিরোধী। ভারতীয় বস্তুবাদের সঙ্গে এর আত্মীয়তাটি স্পষ্ট।

৪। উপসংহার

ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম থাকলেও প্রতিটি দেশ বা জাতির ইতিহাস স্বতন্ত্র। ইতিহাসের সাধারণ নিয়মে আমাদের দেশে পুঁজিবাদ-সামন্তবাদকে প্রতিস্থাপিত করেছে। কিন্তু এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি উপনিবেশের প্রান্তস্থ দেশ বলে উপনিবেশের কেন্দ্রস্থ দেশ থেকে ভিন্ন। তাই এ দেশে সামন্ততন্ত্রীয় ও এর অনুষঙ্গী ধর্মতন্ত্রীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জের এখনো প্রকট। এ দেশে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা এখনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি। এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মহলেও বিজ্ঞান-সংস্কৃতি অনুপস্থিত। শুধুমাত্র গ্রন্থের সঙ্গে আক্ষরিক মিল নেই বলে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রহণে শিক্ষিতজনেরও আপত্তি। গ্রন্থে নেই বলে সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার অস্বীকৃত।

> "এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
> যেদিন হিন্দু-মুসলমান
> বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
> জাতিগোত্র নাহি রবে।"

কাজেই এনলাইটেনমেন্টের মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন এ দেশে এখনো প্রাসঙ্গিক। আশার কথা, আমাদের ঐতিহ্যে আমাদের এপিকুরসরা রয়েছেন। ইউরোপীয়রা যেমন তাদের এনলাইটেনমেন্টে তাদের এপিকুরসকে কাজে লাগিয়েছিল, আমরাও আমাদের উদ্দিষ্ট এনলাইটেনমেন্টে আমাদের এপিকুরসদের কাজে লাগাতে পারি।

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক

ইমেইল: bidhanranjan@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. উপনিষদ (বারোটি প্রাচীন উপনিষদের সংকলন), অনুবাদ ও সম্পাদনা: অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লকান্ত বসু, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৬

২. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১

৩. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিগ্‌দর্শন (২য় খণ্ড), অনুবাদ: ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩

৪. নৃপেন্দ্র গোস্বামী, ভারতীয় দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭

৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৭

৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, অনুষ্টুপ প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩

৭. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, স্বদেশ, কলকাতা, ২০১০

৮. হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন*, অবভাস, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১১

৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯

১০. মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ*, অনুবাদ: সুশীল ভদ্র, কলকাতা, ১৯৯০

১১. রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণের ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১৯

১২. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১০

১৩. ড. তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ : এস মুজিব উল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫

১৪. আশীষ লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার দত্ত, *আঁধার রাতে একলা পথিক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

১৫. যতীন সরকার (বাংলার প্রাকৃতজনের দর্শন), *প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

১৬. যতীন সরকার (পাগল দ্বিজদাস : লোকায়ত বাংলার প্রজ্ঞাবান কবি), প্রান্তিক ভাবনাপুঞ্জ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

১৭. যতীন সরকার, বাংলা কবিতার মূলধারা ও জালাল উদ্দীন খাঁ, শাহ আবদুল করিমের গীত : *সর্বহারার দুঃখজয়ের মন্ত্র*, বাংলা ১৪১৭

১৮. কবিতার মূলধারা এবং নজরুল, রুকু শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১

১৯. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা, ৮ম মুদ্রণ, ১৯৯৯

২০. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯

২১. Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. I-V, Motilal Banarasidass, Delhi, 6th Reprint, 2010

২২. Brajendranath Seal, *The Positive Science of The Ancient Hindus*, Sahitya Samsad, Kolkata, 2001

২৩. Debiprasad Chattopadhya and others, *History of Science and Technology in Ancient India*, Vol. I-III, Firma KLM Pvt. Ltd., Kolkata, 1986, 1991, 1996

২৪. V. Brodov, *Indian Philosophy in Modern Times*, Progress Publishers, Moscow, 1984